বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লব

আমিনূল মোহায়মেন
mohaimen@bdonline.com

শিল্প বিপ্লবের পথঃ

দরিদ্র দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদশেকে যেখানেই দেখানো হোক না কেন, গত দু' যুগে এদেশটি খাদ্য উৎপাদনে এক নীরব বিপ্লব ঘটিযে ফেলেছে। খাদ্য শস্যে আমরা অনেকটাই স্বযং সম্পূর্ন। বাংলাদেশ চাল রপ্তানীও করে থাকে। অনেকেরই ধারনা যে, খাদ্য সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবার আশংকায় সরকার তার হিসাব নিকাশে এই খাদ্য স্বনির্ভরতার বিষয়টি চেপে যায়।

বাংলাদেশের সফল কৃষি বিপ্লবের পথ ধরে কিভাবে একটি শিল্প বিপ্লব ঘটানো যায়, সে বিষয়টি এ প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

বাংলাদেশের কৃষিতে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে এদেশের কৃষকেরা। সরকার সমূহের ভূমিকা যে ছিল না তা নয়; কিন্ত সে ভুমিকা ছিল কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি উপকরণকে কৃষকের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়া। বাকী কাজ করেছে কৃষকেরা নিজে।

কৃষকদের ভূমিটাকা খুব গুরুত্বপূর্ন। কেননা, তারা আমাদের দেশের সব থেকে পশ্চাদপদ অংশ। লেখাপড়া শিখলে কেউ আর চাষ করে না। বলা যায় তাদের সবাই অশিক্ষিত। অর্থ সম্পদশালী কেউ সাধারনতঃ কৃষিতে যায় না। আমাদের দেশের কৃষকরা এত গরীব যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বীজ বা সার কেনার অর্থ থাকে না। বিনিয়োগ বলতে যা বুঝায় এ ক্ষেত্রে তা একদমই অনুপস্থিত; বিদেশী বিনিয়োগের কথা তো দূরে থাক।

গত দু'যুগে বাংলাদেশে অনেক ওলট পালট হয়েছে। আন্দোলন, সংগ্রাম, হরতাল কোন কিছুতেই আমাদের কৃষির অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি।

কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্যের মূলে ছিল দুটি বিষয়ঃ

ক. সরকার বা গুটি কয়েক উদ্যোক্তার উপর নির্ভর না করে কোটি কোটি কৃষক তাদের নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের চেষ্টায় চাষাবাদ করেছেন।

খ. সরকার কৃষকদেরকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে।

কৃষিতে বাংলাদেশ যেমন সফল, শিল্পে তেমনই ব্যর্থ। শিল্পে আমাদের ব্যর্থতার পিছনে রাষ্ট্রীয়করণ, আইন-শৃঙ্খলার অভাব, তিন পাশ্বে একটি বৃহৎ কিন্তু সংকীর্ন প্রতিবেশীর অবস্থান-ইত্যাদি থাকলেও মূল কারণ হচ্ছে শিল্পায়নে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সমৃক্ত করতে ব্যর্থতা।

শিল্প বিপ্লবের কৌশল নির্ধারণঃ

বাংলাদেশে যেমন একটি নীরব কিন্তু সফল কৃষি বিল্পব হয়েছে, তেমনি একটি শিল্প বিপ্লবও ঘটানো সম্ভব। বরং শিল্প বিল্পবের সম্ভাবনা অনেকগুন বেশী। কেননা, এ বিপ্লব যারা ঘটাবেন তারা কৃষকদের থেকে অনেক বেশী শিক্ষিত এবং অনেক বেশী অর্থশালী।

যে দুটি বিষয়কে আমাদের শিল্পায়নের মূল বাধা হিসাবে দেখা হয় তা সহসাই দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন হঠাৎ করে হবে না। বলা হয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এর উন্নয়ন করা যায়। এই রাজনৈতিক সদিচ্ছা শুধু দলগুলোর শীর্ষ দু'একজনের থাকলে হবে না, দলের সকল স্তরেই থাকলে হবে। আমাদের প্রধান দল দুটির ক্ষেত্রে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে সময় লাগবে। তাছাড়া কর্মসংস্থানের অভাব ও যুব সমাজকে সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতির দিকে আগ্রহী করে তোলে।

আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে বাংলাদেশের তিনদিকে একটি শক্তিশালী ও সংকীর্ণ প্রতিবেশীর উপস্থিতি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ তাদের পন্যের একক বৃহত্তম বাজারে পরিনত হয়েছে। বৈধ ও অবৈধ মিলিয়ে এ বাণিজ্যের পরিমান বিশ হাজার কোটি টাকারও বেশী। পৃথিবীর অধিকাংশ আগ্রাসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্য দেশের আভ্যন্তরিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ইত্যাদির মূল কারণ অর্থনৈতিক। সুতরাং এই বিশ হাজার কোটি টাকার এক সহস্রাংশ যে সে দেশের সরকার ও ব্যবসায়ী মহল বাংলাদেশে শিল্পায়নের অনুপযোগী পরিবেশ বজায় রাখতে ব্যয় করবে না, তা মনে করার কোন কারণ নেই। এ পরিস্থিতিও হঠাৎ করে পাল্টানোর কোন সম্ভাবনা নেই।

কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বা হতাশা প্রকাশ করা এ লেখার উদ্দেশ্যে নয়। বরং শিল্প বিপ্লবের কৌশল নির্ধারণের সময় আমরা যেন আপাততঃ স্থায়ী অন্তরায় গুলো বিবেচনায় রাখতে পারি সে কারনেই এ বিষয়গুলোর অবতারণা।

এবার শিল্প বিপ্লবের জন্য উপযোগী উপকরণগুলো দেখা যাক। আমরা প্রায়ই নিজেদেরকে 'হুজুগে' বলে গাল দিই। এক সময় কোচিং সেন্টারের 'হুজুগ' ছিল। পাড়ায় পাড়ায় তখন কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। তারপর কম্পিউটার সেন্টার হয়েছে একই ভাবে। এখন অনেকে বলছেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে ব্যাংঙ এর ছাতার মত। রিয়েল এষ্টেট ব্যবসাও এভাবেই বেড়ে চলেছে।

এই 'হুজুগে বাঙ্গালী'র গালিটাকে আমি অন্যভাবে দেখি। এর পিছনে হুজুগ যতটুকু কাজ করে তার থেকে অনেক বেশী কাজ করে কোন একটা কিছু করার আকাংখা। এইসব ব্যাংঙ এর ছাতা'র মত গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বা রিয়েল এষ্টেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রমান করে আমরা কতটা উদ্যমী। অর্থ বা উদ্যমের যে অভার আমাদের নেই-এটি তারই প্রমান।

আমরা প্রায়ই বিদেশী বিনিয়োগের কথা বলি। বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমাদের এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে, বিশ হাজার টাকা খরচ করে একটা সেমিনার করতেও আমাদের বিদেশী সহায়তা খুজি। অথচ, দেশের মানুষ তাদের হাতে আটকে পড়া টাকা বিনিয়োগ করার পথ খুজে পাচ্ছে না।

আমাদের দেশের মানুষের হাতে যে টাকা আছে, তার বড় প্রমান আমাদের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা। ঢাকার ধানমন্ডিতে দশ কাঠার একটি প্লটে বিশটা এপার্টমেন্ট হচ্ছে যার দাম কম করে আট কোটি টাকা। আমাদের টাকা না থাকলে এই কোটি কোটি টাকা আসছে কোথা থেকে?

এতো গেলো উচ্চ মধ্যবিত্তের কথা। নিম্ন মধ্য বিত্তের অবস্থাও যত খারাপ মনে করা হয় ততো খারাপ নয়। বিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে দুই হাজার টাকার পিয়নের চাকুরী চায় এমন লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে মিলিয়ন পেরিয়ে যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে অর্থ বা উদ্যোগের অভাব আমাদের নেই। শিল্পায়নের জন্য যে মেধার প্রয়োজন আমাদের কি তার অভাব আছে? এর উত্তর 'না'। ঢাকাতে ধোলাই খাল বলে একটি স্থান রয়েছে। এখানে গেলে বোঝা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধিটা আমাদের জন্মগত। কেননা, সেখানে প্রায় নিরক্ষর শতশত শ্রমিক কোন রকম শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই জটিল যন্ত্রপাতি বানিয়ে চলেছেন। বিশ্বের যে স্থানেই এদেশের নাগরিকেরা গিয়েছেন, সেখানেই তারা তাদের মেধা ও যোগ্যতার প্রমান রেখেছেন।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শিল্পায়নে একটা বাধা বটে। আপনি একটি কারখানা স্থাপন করতে যাবেন, এলাকার মাস্তানেরা আসবে চাঁদা চাইতে। কিন্তু ব্যাপক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এটি কোন বাধা হবে না। যদি ঘরে ঘরে শিল্প গড়ে উঠতে পারে তাহলে পাড়ার মাস্তান বলে কিছু বেশী দিন থাকবে না। তাদের অনেকেই হয়ে যাবে ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক।

ঢাকাতে বর্তমানে 'হোম-মেইড' খাবারের ব্যাপক প্রচন শুরু হয়েছে। এমনকি অভিজাত এলাকার গৃহিনীরাও হাতে খাবার বানিয়ে বিক্রি করছেন। সন্ত্রাস এক্ষেত্রে কোন বাধা হচ্ছে না।

সন্ত্রাস যদি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অলংঘনীয় বাধা হত তাহলে ঢাকাতে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা এভাবে রমরমা অবস্থায় আসতে পারতো না। কেননা, সব থেকে বেশী চাঁদাবাজির শিকার হতে হয় ঘরবাড়ী বানানোর সময়।

বরং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান বাধা রয়েছে অন্যখানে। এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হচ্ছে আমাদের 'চাকরী' মানোসিকতা। আমরা স্কুলে ভর্তি হই এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, লেখাপড়া শেষ করলে আর কাজ করতে হবে না। একটা চাকরী পাবো। মাস গেলে বেতন পাবো। লেখাপড়া শেষ করার পরও কাজ কররেত হবে, ব্যবসা করতে হবে, এই ধারনা সহজে আমরা গ্রহন করতে পারি না।

এটি আমাদের এ প্রজন্মের দোষ নয়। বরং ঐতিহ্যগত ভাবেই আমাদের সমাজ কাঠামো কর্মবিমুখ। এক সময় এখানে যে শ্রেণীভেদ প্রথা ছিল সেখানে ও কর্মজীবিদেরকে রাখা হয়েছিল একদম নীচে।

ফলে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেনী স্বউদ্যগী হয়ে কোন কিছু করতে পারছে না।

দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে আমাদের জাতি হিসাবে আত্মমর্যাদার অভাব। আমাদের ধারনা যা কিছু বাংলাদেশের বাইরের তাই ভালো আর যা কিছু বাংলাদেশের তাই-ই খারাপ। এমন মধ্যবিত্ত পাওয়া দুস্কর যিনি দোকানে গিয়ে বিদেশী পন্য খোজেন না। তিনি দাঁত মাজবেন, তার জন্য বিদেশী পেস্ট দরকার। তিনি গোসল করবেন, তার জন্য বিদেশী সাবান দরকার। আমরা দু' দু বার স্বাধীন হয়েছি বটে, কিন্তু নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানবোধ আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। ফলে যদিও বা কেউ কেউ এগিয়ে আসাছেন শিল্প প্রতিষ্ঠায়, তাদের পন্য দেশেই বাজার পাচ্ছে না।

বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে হলে এই দুটি মূল বাধা দূর করতে হবে। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে কর্মবিমূখতার উত্তরাধিকারকে কর্মমুখীতাতে পরিনত করতে হবে। এসব প্রচারনার পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে।

প্রচারনার বাংলাদেশে খুব কাজ করে। শিক্ষার হার কম থাকা সত্বেও শুধুমাত্র প্রচারনার কারনেই পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশে ব্যাপক সাফল্য এসেছে।

এই প্রচারনার দায়িত্বটি সরকারকে নিতে হবে। সরকারের উচিৎ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি গণ-শিল্পালয় (Mass Industrialisation) ইউনিট খোলা। তার কাজ হবেঃ

ক. ব্যাপক প্রচারনার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা

খ. ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব সেগুলি নির্নয় করে, সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত দিক নির্দেশনা (যেমন কি ধরনের কাচামাল লাগবে, যন্ত্রপাতি লাগবে। জনশক্তি লাগবে, তাতে কেমন খরচ হবে, কেমন লাভ হবে ইত্যাদি বিস্তারিত) সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করা এবং তা সহজ লভ্য করা।

গ. বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিল্প মেলার আয়োজন করা। তাতে যে সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সহজে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেগুলির বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হবে। এসকল মেলা খুবই ফলপ্রসু হবে। কেননা, ছাত্র-ছাত্রীরা শেষ বর্ষে পৌঁছাতে পৌঁছাতে চাকরীর চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই এককভাবে বা দলবদ্ধ ভাবে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবে। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শহরেও এ ধরনের মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।

ঘ. গণ-শিল্পায়ন যাতে NGO সমূহ সমৃক্ত হয় তার ব্যবস্থা করা।

ঙ. বাংলাদেশী পন্য কেনার ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্য প্রচারনা চালানো। 'স্বদেশী পন্য কিনে হও ধন্য' জাতীয় দায়সারা প্রচারনা না চালিয়ে বরং বাংলাদেশী পন্য কেনার ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে যে গতি সঞ্চার হবে এবং তার ফল যে, সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষ পাবে, চাকরির নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস থেকে বাঁচার মাধ্যমে, তা তুলে ধরতে হবে।

প্রচারনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহ, মিডিয়া ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এগিয়ে আসতে পারে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল ও মিডিয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা দিনে দিনে কমে চলেছে। জনসাধারনের ধারনা যে, ক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতায় গিয়ে তার অপব্যবহার ছাড়া আমাদের রাজনীতিকদের আর কোন বিষয়ে মাথা-ব্যথা নেই। একইভাবে মিডিয়ার ব্যাপারে একটি সাধারন অভিযোগ হচ্ছে যে, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থ উদ্ধার এবং কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারে এগুলো হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। অনেকে আবার তাদের কাউকে কাউকে প্রতিবেশী দেশের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত বলে সন্দেহ করেন। বাংলাদেশী পন্য কেনার প্রচারনা তাদেরকে এই সকল সন্দেহ ও ধারনা থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত করবে।

এর পাশাপাশি সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে শিল্পায়ন বিরোধী বাণিজ্য-নীতি পরিবর্তন করা। অনেক বাংলাদেশী পন্য দেশের বাজারে টিকতে পারে না তথাকথিত ’উদার’ বাণিজ্য নীতির কারনে। আমরা আমাদের বাজারকে একতরফাভাবে খুলে দিয়েছি প্রতিবেশী দেশের জন্য। অথচ, আমাদের দুই-একটা পণ্য সেখানে বাজার পাওয়া শুরু করলেই তারা আইন করে ও অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে সেগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। আমাদের নীতি নির্ধারকগনকে কে বুঝাবে যে, আমরা একটি স্বাধীন জাতি। আমাদের বাণিজ্য নীতি আমাদের স্বার্থেই হওয়া উচিৎ।

বিরাষ্ট্রীকরন প্রসঙ্গঃ

এ কথা সত্য যে, আমাদের শিল্পের উপর সব থেকে ভয়াল আঘাতটি আসে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে। শিল্প-সম্ভাবনাময় একটি দেশকে রাতারাতি রুগ্ন শিল্পের দেশে পরিনত করা হয়েছিল। তার মানে এই নয় যে, রাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পগুলিকে আবার বিরাষ্ট্রীকরণ করলে সেই সম্ভাবনাময় অবস্থা ফিরে আসবে। এ পর্যন্ত যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীকরণ করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশের অস্তিত্বই নেই। দূর্নীতির কারণে এ সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানও তাদের জায়গা-জমি পানির দামে সরকারের প্রিয় লোকদের কাছে বিলিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই পানির দামটিও সরকার ফেরত পায় না। এদিকে উক্ত কারখানা যে সকল পন্য উৎপাদন করতো বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাজার দখল করে নেয় প্রতিবেশী দেশের পন্যে।

বেসরকারী খাতে যে সকল শিল্পের তেমন বিকল্প গড়ে ওঠেনি সেগুলিকে কোনক্রমেই রাতারাতি বিরাষ্ট্রীকরণ করা যাবে না। বরং বেসরকারী খাতে উক্ত শিল্পের বিস্তার ঘটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তখণ বিরাষ্ট্রীকরণ করলে তার তেমন কোন ফল যেমন ভোক্তা সাধারনের উপর পড়বে না, তেমনী ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীরা বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের চাকরী পাবেন।